ভারতের কৃষি – অপরাজিতা মুখোপাধ্যায় – গ্রন্থালোচনা

পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়

ভারতের কৃষি অর্থনীতির বিবর্তনের আলোচনার ক্ষেত্রে লেখক তাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে মূলত ব্যবহার করেছেন আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে মার্ক্সীয় ধারাটি, যেখানে পরিবর্তন বা উন্নয়ন নির্ভর করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের উপর, বিশেষত উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতার উপরে, যে-দ্বান্দ্বিকতার প্রকাশ ঘটে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ও ব্যবহারে। উৎপাদনের উপকরণের মালিক ও উপকরণগুলির ব্যবহারকারীদের মধ্যে সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উদ্বৃত্তের উপর অধিকার ও তার ব্যবহারের ফলে রূপ পায় শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব এবং অগ্রগতির দ্বান্দ্বিক সূত্র। এই ধারায় ভারতের কৃষির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বোঝানোর উদ্দেশ্যে লেখক সিন্ধুসভ্যতার সময়ের কৃষি উৎপাদন এবং আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলির আলোচনা করেছেন। এরপর একে একে আলোচনায় এসেছে মুঘল ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ভারতের কৃষির পরিস্থিতি এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলি জুড়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির চলনের বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মার্ক্সীয় ধারায়, সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগে পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হল ধনতন্ত্র।লেখকের বক্তব্য,পুঁজি সঞ্চয়ন ও পুঁজির ব্যবহারের নিরিখে ভারত ধনতান্ত্রিক প্রগতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি।আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিশেষত উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষির পিছিয়ে-পড়া বা পিছিয়ে-থাকা চরিত্র আগাগোড়া আলোচিত হয়েছে। এই সম্পর্কগত কারণেই ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষত শিল্পে কৃষিক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা স্বাধীন শ্রমিক ও মুক্ত শ্রমের বাজারের উদ্ভব ঘটেনি। পুঁজি সঞ্চয়ন এবং বিনিয়োগের ধারাও উন্নত দেশগুলির তুলনীয় পথে বহমান হতে পারেনি। কৃষিক্ষেত্রের এই জাড্যকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে মার্ক্সীয় ধারণা ‘এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন’-এর আলোয়। লেখক সিন্ধুসভ্যতার মূলত কৃষিভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে এই মার্ক্সীয় ধারণার সত্যতা তুলে ধরেছেন।

সিন্ধুসভ্যতায় কৃষি-উদ্বৃত্তের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তা তৎকালীন রাষ্ট্র তথা সমাজের উপরের দিকের মানুষেরা আত্মসাৎ করত, মার্ক্সীয় ধারায় যাকে শোষণ বলা হয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভবত ছিল ঈশ্বর ও মন্দিরভিত্তিক। মুঘল শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজস্বের বেশিটাই আসত কৃষি থেকে। জায়গিরদারি, জমিদারি ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি-উদ্বৃত্তে সমাজের উপরতলার মানুষের অধিকারও সুনিশ্চিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কৃষি থেকে রাজস্ব আদায়ের ধারা বজায় রাখে ও বাড়িয়ে তোলে এবং জমিদারি ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনে। মুঘল বা ব্রিটিশ আমলে ভারতের কৃষির অর্থনৈতিক কাঠামো ধনতান্ত্রিক পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। অথচ তুলনামূলক সমকালে ইওরোপে সামন্ততন্ত্র ভেঙে ধনতান্ত্রিক লক্ষ্যে উত্তরণের আয়োজন পুরোদমে চলেছে। ভারতে কৃষি উৎপাদনী কাঠামোয় ‘জাড্য’ রয়ে গেছে।

ব্রিটিশ এদেশে ধনতান্ত্রিক গতিশীলতা আমদানি করতে আসেনি। তারা এসেছিল নিজেদের ধনতান্ত্রিক স্বার্থে। উপনিবেশগুলিকে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎস এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা এবং অন্যান্যভাবে শোষণ করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে, ভারতে ধনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে না-উঠলেই তাদের সুবিধা। ব্রিটিশ বনাম ভারত এই দ্বন্দ্বের চিত্র আভাসিত হয়েছে ভারতের উদীয়মান পুঁজিপতিদের একাংশের ব্রিটিশ-বিরোধিতাতথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পে এবং পরবর্তীতে পরিষেবা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এবং বেসরকারি উদ্যোগে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু, কৃষিক্ষেত্রের জাড্য ঘোচেনি। এই কারণেই শিল্পেও বিশেষ করে উৎপাদনী শিল্পে সার্বিক পুঁজিবাদী গতিশীলতা দেখা দেয়নি। কৃষিতে পুঁজিবাদী উদ্যোগ গড়ে ওঠেনি। পুঁজি সঞ্চয়ন ও ফলত বিনিয়োগ গতিশীল পুঁজিবাদী লক্ষ্যে ঘটে ওঠেনি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বেড়েছে। স্বাধীন শ্রমিক ও শ্রমের মুক্ত বাজার তৈরি হয়নি। এর কারণ খুঁজতে লেখক ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি এবং ভূমিসংস্কার আইন ও তার প্রয়োগ আলোচনা করেছেন। পরিকল্পনাগুলির বিভিন্ন ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা অনেকেই আলোচনা করেছেন, এই গ্রন্থেও সেসবের বিশ্লেষণ আছে। বিরাট দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ ও আইনগুলি অনেকাংশে দিশাহীন থেকেছে।কংগ্রেস কৃষি-সংস্কার কমিটি সম্পর্কে লেখক

বলছেন “তারা কৃষি সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক অবস্থানে ছিলেন না।”এই পর্যবেক্ষণ হয়তো ভূমিসংস্কার কর্মসূচীগুলির ক্ষেত্রে সার্বিকভাবেই প্রযোজ্য।

গ্রন্থে বেশকিছু তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে যেগুলির পর্যালোচনা ভারতের কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে – এক, ভারতে বড় জোত কমছে। শিল্পক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের মধ্যে কারবারের ঘনীভবন, একচেটিয়া কারবার বেড়ে চলা, দেশে সাধারণভাবে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়া, এসবের পাশে কৃষিক্ষেত্রে উলটো ঘটনা মনোযোগ দাবী করে। দুই, ছোট জোতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ভারতে সমবায় আন্দোলন দানা বাঁধেনি। তিন, জোতের আয়তন ও জমির উৎপাদনশীলতার পারস্পরিক সম্পর্ক মোটের উপর ধনাত্মক। এই বিষয়ে এককালে কম বিতর্ক হয়নি। চার, জোতের আয়তন কমলেও,চাষ শ্রমিকনির্ভর হয়ে উঠছে এমন নয়। অন্যদিকে, কৃষিতে যন্ত্রনিবেশের ফলে অনেক জায়গাতেই কৃষিতে শ্রমের উপর খরচের অনুপাতকমছে। কৃষিতে পারিবারিক শ্রম এখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মুক্ত শ্রমিক কমই। ঋণ-বন্ধকি শ্রমিক কম নেই দেশে এমনকী, পঞ্জাবেও। পাঁচ, শ্রমিক নিয়োগে জাতপাত, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদির প্রভাব। ছয়, কৃষিতে ব্যাপক কর্মহীনতাকে কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রকাশ বলে ধরা যাচ্ছে না। অসংগঠিত শিল্পের পাশাপাশি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রবণতা বেড়ে চলেছে। মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার আরও বেশি বাড়ছে। সাত, কৃষি-ঋণের বাজারে আজও অসংগঠিত ঋণব্যবস্থার প্রাধান্য। আট, চাষীদের ঋণগ্রহণ ও আত্মহত্যা এবং এক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা। লক্ষণীয় যে, কৃষিতে অগ্রসর রাজ্যগুলিতে আত্মহত্যার ঘটনা বেশি। নয়, নিবিড় চাষ এবং ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহার জমির উর্বরতা কমায়, জলস্তরে বিপর্যয় আনে। দশ, ফসলের বাজার ব্যবস্থায় বহু ত্রুটি নজরে পড়ে। ছোট ও আধা-মাঝারি চাষিরা সরাসরি রাইসমিলে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারে না। ফসল ওঠার আগেই তারা বড় চাষি-ব্যবসায়ী-মহাজনদের কাছে ঋণে বাঁধা পড়ে যায়। এগারো, উন্নত দেশগুলির স্বার্থে ফান্ড-ব্যাংকের চাপে গৃহীত উদারীকরণ নীতির ফলে কৃষিতে সরকারি ভর্তুকি কমেছে। সরকার-ঘোষিত ন্যূনতম উৎপাদন-মূল্যের স্তরও বাজার-দামেরও নীচে নেমে যায়। অথচ, কৃষিতে সরকারি ভর্তুকি ও তাদের পক্ষে অনুকূল শুল্কব্যবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইওরোপের কিছু দেশ ও আমেরিকার ক্ষেত্রে রফতানি-দ্রব্য হিসেবে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে ভারতীয় চাষি। বারো, ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎপাদনে জল ও অন্যান্য

উপকরণ বেশি লাগে। ফলে, এসবের উৎপাদনী ব্যয় বেশি, জমি থেকে আয় কম এবং পরিবেশেরও ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে, ফান্ড-ব্যাংকের পরামর্শ, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি খাদ্যশস্যের চাষ কমিয়ে, সবজি, ফল ইত্যাদি হালকা অধিক মূল্যের ফসলের চাষ বাড়িয়ে দেশে শস্যবৈচিত্র্য বাড়াক। লক্ষ্যণীয়, ইওরোপের কয়েকটি দেশ এবং আমেরিকার দখলে আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খাদ্যশস্য রফতানির সিংহভাগ। এই শস্যবৈচিত্র্য বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করলে ভারত খাদ্যশস্যের জন্য এই দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। দেশের খাদ্য-স্বনির্ভরতা বিঘ্নিত হবে। লেখক দেখিয়েছেন যে, সবজি চাষ করলেই যে আয় খুব বাড়ে তাও নয়। তাছাড়া, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের পুষ্টির উৎস মূলত ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য ও ডাল। দেখা যাচ্ছে সবজি চাষ বেশি হয় এমন অনেক অঞ্চলেই মানুষের গড় পুষ্টির পরিমাণ কম।
বইটিতে ভারতের কৃষির এমন আরও বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক কৃষি আইনগুলি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে।

এমন বিস্তৃত গবেষণাধর্মী গ্রন্থের বিভিন্ন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন ওঠা ও বিতর্কের সূত্রপাত হওয়া স্বাভাবিক। প্রশ্ন ও বিতর্ক বিষয়গুলির সারবত্তাই প্রমাণ করে, মননশীল পাঠক ও মনোযোগী গবেষকের আলোচনা ও বিচার এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সেটিও আলোচ্য গ্রন্থেরই অবদান।
আলোচনা হতে পারে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির বিচারে মার্ক্সীয় ‘এশিয়াটিক মোড অফ প্রডাকশন’ ভাবনার প্রয়োগের যাথার্থ্য কেন্দ্র করে। অতীতে এই বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে এবং ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদরা অনেকেই ভারতের ক্ষেত্রে এই মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতের কৃষির বিবর্তনের ছবি দেওয়ার ক্ষেত্রে সিন্ধুসভ্যতার উল্লেখের পরেই কেন উল্লিখিত হল মুঘল আমল। মাঝখানের বিস্তৃত সময় যখন বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ শাসন করেছেন মৌর্য, গুপ্ত, পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজবংশ, সেই আমলের কৃষি অর্থনীতি আলোচিত হল না কেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল বক্তব্য, ব্রিটিশ তার স্বার্থে দেশজ পুঁজি সঞ্চয়ন ও দেশীয় পুঁজিপতিদের বাড়তে দেয়নি। কিন্তু, এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না যে, ব্রিটিশ না এলে কি এগুলি ঘটতে পারত? এশিয়াটিক মোড অফ প্রডাকশন ও তার অন্তর্নিহিত জাড্য ও স্থবিরত্বের ধারণা মাথায় রাখলে বলতে হয় যে, পারত না। ইওরোপে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক থেকে পুঁজিতান্ত্রিকে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে মার্ক্সীয় ধারায় দীক্ষিত অর্থনীতিবিদদের মধ্যেই

ঘোর বিতর্ক আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, ইওরোপীয় বিবর্তন ধারার সঙ্গে ভারতীয় পরিস্থিতি কতটা তুলনাযোগ্য? পাশাপাশি, উন্নয়নের সার্বিক গতিপ্রকৃতির বিষয়ে তথাকথিত মূলস্রোতের তাত্ত্বিক ভাবনার অস্তিত্বও কম নয়। সেসব ভাবনাও সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য এই ধারণাও মান্যতা পায়নি।ইওরোপের দেশগুলির পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের স্তরে উন্নীত হওয়ার পথে চাষিদের জমি থেকে উচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া, কল-কারখানার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান এবং আজ যাকে আমরা বলি মানবাধিকার, সেই অধিকার ভঙ্গের ইতিহাস মনে রাখা জরুরি। আমেরিকা এবং এমনকী অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডেও উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা রূপ পেয়েছে গরিব মানুষ, ক্রীতদাস এবং সেসব জায়গার আদিবাসীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে। এককালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং আজকের চিন ঘটাচ্ছে তাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। চিনা গবেষকদের লেখাতেই উল্লেখ আছে পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্বার্থে চাষিদের তথা গ্রামীণ জনতার যন্ত্রণাদীর্ণ উচ্ছেদ ও স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনাবলীর। ইওরোপ, আমেরিকা হোক কি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চিন, উন্নয়নশীল পুঁজিভিত্তিক কাঠামো শুধু অর্থনৈতিক মুক্ত বাজারব্যবস্থা বা মার্ক্সীয় আদর্শানুসারী সমাজতান্ত্রিক কার্যকারণ পদ্ধতির ফলে গড়ে ওঠেনি, সঙ্গেই থেকেছে হয় রাষ্ট্রের মদতে নয় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় মানুষের অধিকার ভঙ্গ এবং পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনাক্রম। স্বাধীন ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারায় উন্নয়নের এমন সার্বিক কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রভূত ত্রুটি সত্ত্বেও কিছু ভাল দিকও আছে যার ফলে আজ দেশ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে পেরেছে এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকারগুলি তথাকথিত জনবাদী প্রকল্প রূপায়নে বাধ্য হয়। সামান্য হলেও, গ্রামীণদরিদ্র জনতার সামান্য সুসার হয়। ভারতের কৃষি অর্থনীতি ও সার্বিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে হয়তো সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন গবেষকের উল্লিখিত শ্যাডো স্টেট বা ছায়া রাষ্ট্রের ধারণার প্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি সক্রিয় থাকে এই ছায়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার অংশীদার অনেকেই – রাজনৈতিক দলগুলির তৃণমূল স্তরের কর্মীরা, সরকারি আমলারা, জমি ও খাদান মাফিয়া, প্রমোটার-ডেভেলপার, সিন্ডিকেট, জোতদার, মহাজনরা, কৃষির বাজারে দালাল ও ফড়ে, এবং আরও অনেকেই। ছায়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা কম নয় এবং স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রের উপর এই ছায়া রাষ্ট্রের প্রভাব যথেষ্ট। বস্তুত, তৃণমূল স্তরে শাসন কায়েম করা এবং সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্র হয়তো ছায়া রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। হয়তো, এভাবে ভাবা যেতে পারে।

গ্রন্থটির কোথাও স্বাধীন ভারতে কৃষিজ আয়ের উপর করের প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ নেই। অথচ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমল অবধি সমস্ত যুগেই সরকারের রাজস্বের বড় অংশ আসত কৃষি থেকে। স্বাধীন ভারতে আজও কৃষিজ আয় করের আওতার বাইরে। কেন? ভারতে বড় চাষিদের চোদ্দো শতাংশের মালিকানায় আছে দেশের তেপান্ন শতাংশ কর্ষিত জমি। কৃষিতে কর বসলে এঁরাই কর দেবেন। আয়ের ভিত্তিতে করের আওতার বাইরে থাকবেন দেশের ছিয়াশি শতাংশ চাষি। তাহলে, কেন কৃষিতে কর নয়?